সা ত দি ন

২৯ অক্টোবর: সরকার বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফার হার হ্রাস করেছে।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন করতোয়াকে 'প্রধানমন্ত্রী ভবন' হিসেবে নামকরণ ও নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩০ অক্টোবর : নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

৩১ অক্টোবর : চলতি ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এডিপির আকার ১ হাজার ৫শ' কোটি টাকা থেকে ২ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত কমানো হবে বলে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

১ নবেম্বর : সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র শবেবরাত উদ্‌যাপিত হয়েছে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কক্সবাজার-৩ (রামু-কক্সবাজার) আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার।

২ নবেম্বর : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে গণভবনের বরাদ্দ বাতিল করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সান্ধ্যকালীন আবাসিক কার্যালয় করায় আওয়ামী লীগের ক্ষোভ প্রকাশ।

রাজধানীর মিরপুরে সন্ত্রাসীরা জবাই করে দুই সহোদরকে হত্যা করেছে।

৩ নবেম্বর : ৮ম জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনে নির্বাচিত ৪ জন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেছেন।

বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের দাবির মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. লুৎফর রহমান পদত্যাগ করেছেন।

৪ নবেম্বর : আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত 'শ্বেতপত্র সেল'-এর কাজ শুরু হয়েছে।

রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রাজধানীর রাস্তায় আর্মড পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন।

কেন আন্দোলন

শেখ হাসিনার আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার আরেকটি কারণ দলীয় কর্মী রক্ষা করা। আওয়ামী লীগের গত পাঁচ বছরের শাসনে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ ও ভোগদখলের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল। এর ফলে জনগণ থেকে তারা বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনে ভরাডুবির পর ঐ নেতা-কর্মীরা নিজ এলাকায় যেতে ও থাকতে আস্থাবোধ করছে না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপি যে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে তারা আরও বেশি গুটিয়ে গেছে। একমাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিই পারে এই নেতা-কর্মীদের সাথে জনগণের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করাতে।... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নতুন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। 'স্থূল কারচুপি' হয়েছে বলে নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে তিনি নির্বাচনের পরপরই ১০ অক্টোবর দেশব্যাপী অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তার সেই ডাকে জনগণ দূরের কথা, দলের নেতা-কর্মীরাই সাড়া দেয়নি। এর ফলে শেখ হাসিনা আন্দোলনের ব্যাপারে কিছুটা দম ধরেছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সভা ডেকে তিনি সংসদে না থাকার সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেও সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনই পল্টন ময়দান থেকে তিনি হাঁক দিয়েছেন নতুন আন্দোলনের। পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ না হলে দেশকে অচল করে দেয়া হবে। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ৫-১১ নবেম্বর দেশব্যাপী সন্ত্রাস প্রতিরোধ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচিও দিয়েছেন তিনি।

দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অবশ্য শেখ হাসিনার এই আন্দোলনের তাড়া দেখে একটু অবাকই বোধ করছেন। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলো নতুন সরকারকে ন্যূনতম একশ' দিন সময় দিয়ে থাকে। শেখ হাসিনা নিজেই '৯৬ উত্তরকালে বিএনপিকে এ ধরনের সরকারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার জন্য কড়া সমালোচনা করেছিলেন। এদিকে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ হরতাল জাতীয় কর্মসূচির বিরোধিতা করার অবস্থান গ্রহণ করেছিল ক্ষমতায় থাকার সময়। সেখানে দেশকে অচল করে দেয়ার তার এই ধমক বস্তুত সে ধরনের কর্মসূচিরই ইঙ্গিত প্রদান করছে। তবে ওয়াকিফহাল মহল বলছে যে, বিএনপি'র আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা শেখ হাসিনার আন্দোলনের তাড়ার এই কারণ। আন্দোলনের উচ্চস্বর কথাবার্তায় নিজেদের দলের মনোবলও চাঙ্গা করতে চান তিনি।

'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ

নির্বাচনের পরপরই শেখ হাসিনা শুরু করেছেন 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ দিয়ে। আসলে এ ধরনের অভিযোগ তোলা ছাড়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ভরাডুবিকে ব্যাখ্যা করার তাদের অবকাশ ছিল না। শেখ হাসিনা নির্বাচনের দিনেও ১৬০-১৭০ আসনে জয়লাভ সম্পর্কে তার দৃঢ় আস্থার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। জনগণের ভোট যে তাদের সব হিসাবকে এভাবে উল্টে দেবে সেটা তারা ভাবেননি। সে কারণে কেবলমাত্র কারচুপির অভিযোগ তুলেই তার পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল, অন্য কোনোভাবেই নয়। শেখ হাসিনা এখন তার ঐ হারার পেছনে চার দল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ছাড়াও সোনাবাহিনী, এমনকি খোদ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের বিরোধী ও চক্রান্তমূলক ভূমিকার কথা

যুক্ত করেছেন। আসলে এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা দলে নিজ নেতৃত্বকেও নিরাপদ রাখতে চেয়েছেন।

প্রসঙ্গ : দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাঁচা

শেখ হাসিনার আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার আরও বড় কারণ দুর্নীতির অভিযোগ থেকে নিজেকে ও নিজের দলকে রক্ষা করা। ক্ষমতা গ্রহণ করেই বিএনপি জানিয়েছে যে তারা আওয়ামী লীগ শাসনামলের দুর্নীতির তথ্য শ্বেতপত্র আকারে জনগণের কাছে প্রকাশ করবে। বিএনপি'র অভিযোগ, আওয়ামী শাসনামলের নির্বিচার দুর্নীতির কারণেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার-ন্যাশনালের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান হয়েছে সবার শীর্ষে, এক নম্বরে। এর ফলে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আওয়ামী শাসনের দুর্নীতির তথ্য উদ্ঘাটন করে এবং তাদের কাউকে কাউকে বিচারের আওতায় এনে বিএনপি বিদেশী রাষ্ট্রগুলো ও দাতাসংস্থার কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়।

আওয়ামী লীগ শাসনামলের দুর্নীতি সম্পর্কে বিএনপি'র এই কঠোর অবস্থান শেখ হাসিনাকে চিন্তিত করে তুলেছে। এ কারণে তিনি এখন নিজেই কাউন্টার অফেন্সিভ চালিয়েছেন এই বলে যে, আওয়ামী লীগের তরফ থেকে

মুদ্রা পাচারের সময় গ্রেফতার হয়েছে পাকিস্তানী যুবক ওয়াকার

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

স্বর্ণ না এবার টাকা

দুই স্যুটকেস ভর্তি টাকা এবং ১৬টি দেশের ফরেন কারেন্সির বিমান কর্মকর্তাদের ফাঁকি দিয়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকা বিমানে ওঠার মুহূর্তে ধরা পড়েছে শুল্ক কর্মকর্তাদের হাতে। শুল্ক কর্মকর্তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের ব্যাগেজ বেল্ট এলাকায় আমিরাত ফ্লাইটের একটি কন্টেইনার থেকে দুটি ডেলসি স্যুটকেস আটক করে। এর মধ্যে একটিতে নিরাপত্তা টেকও লাগানো ছিল। অন্যটিতে তখনও টেক লাগেনি। কিন্তু আটকের পর একটি স্যুটকেসের কেউ মালিকানা দাবি করেনি। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরেকটি স্যুটকেসের সঙ্গে ওয়াকার নামে এক পাকিস্তানি ব্যক্তিকে আটক করেছেন।

স্যুটকেস দুটি থেকে বাংলাদেশী টাকা, ধাতব মুদ্রা, ভারতীয় রুপি, আফগান মুদ্রাসহ প্রায় ১০ কোটি ৪২ লাখ, ৬১ হাজার ৯৮১ টাকার মুদ্রা ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশী মুদ্রা ছিল ১ কোটি ৬৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ৫ কোটি ৯৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকার মার্কিন ডলার, ১৮ লাখ ৫৩ হাজার ৯৫৫ টাকার সৌদি রিয়াল এবং ২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৮৫ টাকার পাউন্ড স্টার্লিং রয়েছে। এই মুদ্রাসহ স্যুটকেস দুটি দুবাই পাচার হচ্ছিল বলে জানা যায়।

আটককৃত পাকিস্তানি নাগরিক সম্পর্কে জানা যায়, তিনি গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিজি-০৩২ বিমানে করাচি থেকে ঢাকা আসেন। এরপর সে ব্যাংকক যাবার জন্য ট্রানজিট যাত্রী হিসেবে বিমানবন্দরের ভেতরেই অবস্থান করছিল। সন্ধ্যা ৭টায় ওয়াকার ডিপারচার লাউঞ্জে যায়। এ সময় তার লাগেজ তল্লাশি করতে চাইলে সে বলে, তার কাছে কিছু নেই। কিন্তু স্ক্যানিং মেশিনে পরীক্ষা করা হলে ২৭ কেজি এলুমনিয়াম কয়েন (১৯৭৪ সালের বাংলাদেশী ১ পয়সা), বাংলাদেশী ৮ হাজার ৯৯০ টাকা, পাকিস্তানি ১২ হাজার ৩০০ রুপি, ইরানি মুদ্রা ১ লাখ ৯০ হাজার, ভারতীয় ১ হাজার ৯০০ রুপি, থাইল্যান্ডের ১ হাজার ৩৬০ বাথ এবং আফগানিস্তানের ৪ কোটি ৯৭ লাখ মুদ্রা উদ্ধার করেন।

জানা যায়, ওয়াকারের কাছে তিনটি পাসপোর্ট ছিল। যার দুটি মেয়াদোত্তীর্ণ। তার বাড়ি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। সে নিজেকে কখনও ছাত্র আবার কখনো ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। সে এর আগেও একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছে। তবে ট্রানজিট যাত্রী হওয়ার কারণে তার পাসপোর্টে বাংলাদেশী ইমিগ্রেশনের সিল পড়েনি। তবে সে একাধিকবার থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় গেছে। এই মুদ্রা রাখা ও ভ্রমণ করাকে তার শখ বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে দাবি করে।

কাস্টম ইমিগ্রেশনের ডিরেক্টর জেনারেল সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, গোপন সংবাদ থাকায় স্যুটকেস ভর্তি টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কারণ স্ক্যানিং মেশিনে মেটালিক কিছু না থাকলে ধরা পড়ে না। সে জন্য প্রথম স্যুটকেসটিতে নিরাপত্তা টেকও লাগানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে গোপন সংবাদ থাকায় আমরা সেটাও আটক করতে সক্ষম হয়েছি। এ ঘটনার সাথে বিমানের কোনো কর্মকর্তা জড়িত আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তদন্ত করে দেখছি কেউ জড়িত আছে কিনা। এ মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলতে চাই না।

জিয়া বিমান ডিরেক্টর জনাব সাইদ জানান, কাস্টম ইমিগ্রেশনে প্রায় দেখা যায় এ ধরনের স্যুটকেস আটক হয়। কিন্তু এগুলোতে টেক লাগানো থাকে না। এবার যে দুটি স্যুটকেস পাওয়া গেল তাতেও কোনো টেক ছিল না। যে একটি টেক লাগানো স্যুটকেস পাওয়া গেছে সেটিও পুরনো। তবে পুরো বিষয়টি কাস্টম হেন্ডেল করে। সেখানে আমাদের কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

একটি সূত্র জানায়, জিয়া বিমানবন্দরে মাঝে মাঝে এ ধরনের স্যুটকেস পাওয়া যায়। ১০ ও ১১ নম্বর গেটে চেকিং হয়। তারপরও এ ধরনের স্যুটকেস পাওয়া গেলে ধারণা করা যেতে পারে যে, এসবের সঙ্গে বিমানবন্দরে কর্মরত লোকজন এমনকি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের হাত থাকতে পারে।

সোনা কিংবা টাকা আটক বিমানবন্দরের নতুন কোনো ঘটনা নয়। শুল্ক বিভাগ এবং বিমান কর্মচারীরা যেমন এসব পাচার রোধ করতে কখনও বলিষ্ঠ হচ্ছে, ঠিক উল্টোভাবে তাদের যোগসাজশে মুদ্রা বা সোনা পাচারের কোনো ঘটনা নয়। তবে সম্প্রতি ঘটনাটি সবচেয়ে বড় মুদ্রা পাচার। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এখনও কাউকে দায়ী করেনি। বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র বিমানবন্দর থানায় জিডি হয়েছে।

জাকির হোসেন

নির্বাচনের পরপরই শেখ হাসিনা শুরু করেছেন 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগ দিয়ে। আসলে এ ধরনের অভিযোগ তোলা ছাড়া আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ভরাডুবিকে ব্যাখ্যা করার তাদের অবকাশ ছিল না। শেখ হাসিনা নির্বাচনের দিনেও ১৬০-১৭০ আসনে জয়লাভ সম্পর্কে তার দৃঢ় আস্থার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। জনগণের ভোট যে তাদের সব হিসাবকে এভাবে উল্টে দেবে সেটা তারা ভাবেননি। সে কারণে কেবলমাত্র কারচুপির অভিযোগ তুলেই তার পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল, অন্য কোনোভাবেই নয়। শেখ হাসিনা এখন তার ঐ হারার পেছনে চার দল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ছাড়াও সোনাবাহিনী, এমনকি খোদ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের বিরোধী ও চক্রান্তমূলক ভূমিকার কথা যুক্ত করেছেন। আসলে এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা দলে নিজ নেতৃত্বকেও নিরাপদ রাখতে চেয়েছেন।

বিএনপি'র '৯১-৯৬ শাসনামলের দুর্নীতি সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে।

কিন্তু এ কথা ঘোষণা দিয়েও আওয়ামী লীগ স্বস্তিবোধ করছে না। কারণ ইতিমধ্যে বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পাসপোর্ট আটক করেছে। প্রথমে অস্বীকার করলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে স্বীকার করেছেন যে দুর্নীতি দমন বিভাগের অনুরোধেই পুলিশ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের পাসপোর্ট আটক করেছে। বিএনপি সরকারের এই পদক্ষেপ আওয়ামী লীগের এসব শীর্ষস্থানীয় নেতা পর্যন্ত আটকে থাকবে না; শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা পর্যন্তও গড়াবে। সুতরাং হাসিনা দুর্নীতির এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখনই আন্দোলনের গার্ড নিতে চান।

কর্মী রক্ষা

শেখ হাসিনার আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়ার আরেকটি কারণ দলীয় কর্মী রক্ষা করা। আওয়ামী লীগের গত পাঁচ বছরের শাসনে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ ও ভোগদখলের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল। এর ফলে জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনে ভরাডুবির পর ঐ নেতা-কর্মীরা নিজ এলাকায় যেতে ও থাকতে আস্থাবোধ করছে না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপি যে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে তারা আরও বেশি গুটিয়ে গেছে। একমাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিই পারে এই নেতা-কর্মীদের সাথে জনগণের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করাতে। দলের অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে বিশাল গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছিল, আন্দোলনের এই কর্মসূচি তা দূর করে তাদের কাছে আনতে পারে বলে দলের নেতৃত্বের ধারণা।

সংগঠন গোছানো

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আওয়ামী লীগ সংগঠন গোছানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে পনেরোটি টিম সব জেলায় যাচ্ছে নির্বাচনে দলে পরাজয়ের কারণ জানা ও দলের মধ্যে আন্দোলনের টিউনিং ফিরিয়ে আনার জন্য। শেখ হাসিনা সংসদের জন্যও তার নতুন টিম গঠন করেছেন। এই টিম তার সাথে সংসদে বিরোধীদলের উপনেতা নিযুক্ত করেছেন সাবেক স্পিকার আবদুল হামিদকে। চীফ হুইপ হয়েছেন উপাধ্যক্ষ শহীদ ও বিরোধী দলনেত্রীর রাজনৈতিক সচিব হয়েছেন সাবেক উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। দলীয় শীর্ষ নেতাদের দলে ও আন্দোলনের কাজে লাগাতে চাচ্ছেন তিনি। এসব নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তাদেরকে সংসদের লাইম লাইট থেকে সরিয়ে রাখার কারণ বলেই মনে হয়।

আত্মরক্ষাই প্রধান

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ দলের জন্য আত্মরক্ষাই এখন প্রধান বিষয়। আর এই কৌশলকে বাস্তবায়ন করতেই আন্দোলনের এই ডংকানিনাদ। তবে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্ষম দল। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সাকা চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেছেন– 'আওয়ামী লীগ প্রফেশনাল বিরোধী দল। বিরোধী দল হিসেবে তারা বিএনপি'র চাইতে যোগ্যতার পরিচয় দেবে।' এই প্রফেশনালিজম থেকে আওয়ামী লীগ যদি আন্দোলন করে তবে বিএনপি সরকারের জন্য অচিরেই সেটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা নয়, আওয়ামী লীগের আক্রমণাত্মক আন্দোলনের কৌশল নেবার সম্ভাবনা।

জেলহত্যা মামলা

শেষ কোথায়!

দেশের আলোচিত দীর্ঘতম মামলা জেলহত্যা। রাজনৈতিক টানাপোড়ন ও আদালতের দীর্ঘসূত্রতার কারণে জেলহত্যা মামলাটি গতিহীন হয়ে পড়েছে। ...লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

স্বাধীনতাউত্তর বিজয়ীবেশে দেশে ফিরে এসেছেন জাতীয় চার নেতা

জেলহত্যা মামলা ক্রমেই দীর্ঘসূত্রতার জালে আটকে পড়ছে। ছাব্বিশ বছরেও মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি। ক্ষমতার পট পরিবর্তনে মামলার ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। যদিও আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেছেন, মামলাটিতে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। মামলা নিজস্ব গতিতেই চলবে। তবে জেলহত্যা মামলার অন্যতম আসামি ওবায়দুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দিতে স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। ওবায়দুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হলে আওয়ামী লীগ আন্দোলনে যাবার হুমকি দিয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরাও জেলহত্যা মামলায় সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দিহান। সবকিছু মিলে জেলহত্যা মামলার ভবিষ্যৎ আবারও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ : *গল্প লেখো গল্প জেতো*

নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো-গল্প জেতো প্রতিযোগিতায় প্রচুর সাড়া পাওয়া গেছে। ৩০ অক্টোবর পাঠানো চিঠি খোলা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। উপস্থিত ছিলেন নেস্‌লের আশরাফ বিন তাজ ও নাজমুল হাকিম, ইউনিট্রেন্ডের মাহফুজ এবং ২০০০-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন 'গল্প লেখো গল্প জেতো' প্রতিযোগিতার কর্মীরা। বর্তমানে গল্পের প্রাথমিক নির্বাচনের কাজ চলছে। শীর্ষ ১০টি লেখা ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় ছাপানো হবে।

ডেট লাইন :
৩ নবেম্বর '৭৫

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ঘাতক দল আশ্রয় নেয় বঙ্গভবনে। বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাককে সামনে রেখে ফারুক-রশিদ-ডালিম সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। তারা মূলত বঙ্গভবনেই অফিস খুলে বসলো। সেখান থেকে নির্দেশ দিতে লাগলো সেনা-বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্ম-কর্তাদের। সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে মুক্তি-যুদ্ধে ২ নং সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ উদ্যোগ নেন। যোগা-যোগ করেন শাফায়েত জামিলসহ উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে। খালেদ মোশাররফ ১ নবেম্বর সকালে সিদ্ধান্ত নেন পাল্টা অভ্যুত্থানের। এদিন সকালে তিনি শাফায়েত জামিলসহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন পুরানা পল্টনের একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নয়া হয়। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের কথা বুঝতে পেরেই খন্দকার মোশতাক সিদ্ধান্ত নেন জেলে আটক

ভর্তি যুদ্ধ

দেশের স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা এখনও শুরু হয়নি। এরমধ্যেই রাজধানীর নামী-দামী স্কুলগুলোতে শুরু হয়ে গেছে বাৎসরিক ভর্তি প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে ঢাকার প্রায় অর্ধ শতাধিক অভিজাত, প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে নিজের সন্তান ভর্তি করতে অভিভাবকদের ছোটাছুটিও শুরু হয়ে গেছে। সারাদেশে স্কুলগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেলেও এর জন্য যুদ্ধে নামে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী। আর এর প্রস্তুতি স্বরূপ সারাবছর অভিভাবকরা সন্তানদের পেছনে কাঁড়ি-কাঁড়ি অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও গাইড নোট গলাধঃ করণের চেষ্টায়ও লিপ্ত হন। অন্যদিকে স্কুলগুলোও শুধুমাত্র ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কামিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা। তবু প্রতি বছর দেশের এই ভর্তি জ্বর যেন ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এই বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ছাড়া হবে সরকারি স্কুলগুলোর ভর্তি ফরম। কিন্তু রাজধানীর অভিভাবকদের প্রধান লক্ষ্য ভিকারুননিসা, হলিক্রস, আইডিয়াল, সিদ্ধেশ্বরী, সেন্ট গ্রেগরি ইত্যাদি নামকরা স্কুলগুলোর ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হচ্ছে সরকারি স্কুলগুলোর অনেক আগেই। গত ৩ নবেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ভিকারুননিসা স্কুলের ফরম বিতরণ। ২২ নবেম্বর থেকে আইডিয়াল এবং ২৮ নবেম্বর থেকে শুরু হবে হলিক্রস স্কুলের ফরম বিতরণ। ছবিতে ভিকারুননিসা স্কুলে বাচ্চার জন্য ফরম ক্রয় এবং তা পূরণে ব্যতিব্যস্ত অভিভাবকরা।

লেখা ও ছবি : এন্ড্রু বিরাজ

প্রবাসী সরকারের কান্ডারী জাতীয় চার নেতাকে হত্যার। কারণ খন্দকার মোশতাক জানতেন পাল্টা অভ্যুত্থানে সফল হলে তারাই চলে আসবে সরকারের নেতৃত্বে। ৩ নবেম্বর মধ্যরাতে খালেদ মোশাররফ আক্রমণ করেন বঙ্গভবনে। ইস্ট বেঙ্গলের ৪৬ ব্রিগেড শাফায়েত জামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল বঙ্গভবন আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। অভ্যুত্থানে অসহযোগিতা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয় সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে। এই আক্রমণের সময় খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে কারাগারে নির্জন শেলে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। ২ নবেম্বর রাত দুটোর সময় কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে এসে থামে সেনাবাহিনীর নম্বর বিহীন একটি জিপ। জিপ থেকে নামে চারজন লোক। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তারা জেলখানার সদর ফটক খুলে দিতে বলে। জেলরক্ষী জানায়, জেলার সাহেবের অনুমতি ছাড়া ফটক খোলা যাবে না। তখন পাশের বাসা থেকে জেলার ডিআইজি প্রিজন একে আওয়ালকে ডেকে আনা হয়। ঘাতক দল বললো, প্রেসিডেন্টের নির্দেশ। আমরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানকে নিয়ে যেতে এসেছি। তখন জেলের কার্যালয় থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে টেলিফোন করা হয়। প্রেসিডেন্ট মোশতাক বলেন, ওরা যা কিছু করতে চায় করতে দিন। এন্থনি ম্যাসকারেনহাস তার বইতে এই টেলিফোন সম্পর্কে লিখেছেন, খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হবার পর থেকেই বাইরের অস্বাভাবিক পরিবেশ প্রেসিডেন্ট ভবনে পড়তে থাকে। একদিকে টেলিফোন বাজছে, অপরদিকে নির্দেশের পর নির্দেশ জারি হচ্ছে। রশিদ বাইরে অবস্থানরত সৈন্যদের ওপর নজর রেখে চলছে। ভোর ৪টা বাজার পর রশিদ একটি টেলিফোন রিসিভ করে। একজন ভারী কণ্ঠে তাকে জানায়, আমি ডিআইজি প্রিজন বলছি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করতে চাই। খন্দকার মোশতাককে টেলিফোন দিলে তিনি শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ করতে থাকেন। প্রিজনের অনুমতি পেয়ে ঘাতকেরা ঢুকে পড়ে জেলে। তখন নিউ জেল বিল্ডিং-এর ১নং রুমে অবস্থান করছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ ও নজরুল ইসলাম। এ বিল্ডিং-এর ২ নং রুম থেকে কামরুজ্জামান ও ৩ নং রুম থেকে মনসুর আলীকে আনা হয় ১ নং রুমে। একত্রিত করার পর তাদের ওপর চালানো হয় গুলি। গুলির পরেও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন কিছু সময়ের জন্য বেঁচে ছিলেন। তাজউদ্দীনের পেটে ও গায়ে গুলি লাগে। অস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন, পানি, একটু পানি। ঘাতকেরা তার আর্তি শুনে ফিরে আসে। আবারও চালায় গুলি। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে জাতীয় চার নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করে।

জেলহত্যা মামলা : ২৬ বছর ধরে

জেলহত্যার পরের দিন তৎকালীন ডিআইজি প্রিজন একে আউয়াল বাদী হয়ে লালবাগ থানায় একটি মামলা করেন। মামলার নম্বর ৪, তারিখ ৪/১১/৭৫। তখন মামলার তদন্ত পড়ে সিআইডির ওপর। পরবর্তীতে সরকার মামলার তদন্ত কাজ স্থগিত করে রাখে। এরশাদের আমলে '৮৮ সালে জেলহত্যার নথিপত্র গায়েব হয়ে যায়। জেলহত্যার পর ঘটনা তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই তদন্ত কমিটিও কোনো রিপোর্ট পেশ করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জেলহত্যা মামলা পুনরুজ্জীবিত করে। '৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর এই মামলার চার্জশিট দেয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় তদন্ত রিপোর্টে অভিযুক্ত সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুর, জাতীয় পার্টির নোতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিএনপি সংসদ সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুকে। মামলাটি নিম্ন আদালতে উঠলে বিচারক চার্জ গঠন নিয়ে বিপাকে পড়েন। আসামিদের আইনজীবী জেলহত্যা মামলায় সিআইডি'র তদন্তকারী কর্মকর্তারা জালিয়াতের আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ তোলে। মামলাটি পড়ে যায় আদালতের দীর্ঘসূত্রতায়। গত ২০ নবেম্বর জেলহত্যা মামলার শুনানি শুরু হয়। এ পর্যন্ত চার্জভুক্ত ৭৫ জনের মধ্যে ৬ জনের শুনানি হয়েছে। মামলার শুনানিও চলছে ধীর লয়ে। কেউ জানে না কবে এ মামলাটি শেষ হবে। নিম্ন আদালতে আরো দুই বছর মামলা চলতে পারে বলে আইনজ্ঞরা জানিয়েছেন। এরপর মামলাটি যাবে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে। পরে আবার আপিলেরা ডিভিশনে।

দেশবাসী প্রবাসী সরকারের যোগ্য নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার চায়। চায় আসামিরা পাক তাদের প্রাপ্ত শাস্তি। আইনের ফাঁক ও রাজনৈতিক কূটকৌশলের খেলায় জঘন্য এ অপরাধীরা যেন পার পেয়ে না যায়। দেশবাসী চায় অপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে জাতির কলঙ্ক থেকে মুক্তি।

ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন সভা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর এক সভা ৩১ অক্টোবর ২০০১ 'ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার'-এ ব্যাংকের বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান শাহ্ আবদুল হান্নান সভায় সভাপতিত্ব করেন। আল রাজী কোম্পানি ফর ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড, সৌদি আরবের প্রতিনিধি ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল রাজী, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)'র প্রতিনিধি অধ্যাপক কোরকুত ওজাল এবং ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আল খতিবসহ দেশী-বিদেশী ডাইরেক্টরগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের ভবিষ্যৎ ব্যবসা-কৌশল সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

‘পুলিশ বাহিনীর কিছু ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রয়েছে’

মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী
আইজিপি

মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীকে গত ৫ নবেম্বর পুলিশের নতুন আইজি নিয়োগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ওইদিন সন্ধ্যায় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তার নিয়োগের আদেশ দেয়। আইজিপি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি এডিশনাল আইজি’র (প্রশাসন) দায়িত্বে ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরে তাৎক্ষণিকভাবে সাপ্তাহিক ২০০০কে সাক্ষাৎকার দেন।... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **স্বপন রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার প্রথম কাজ কি হবে?

আইজিপি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী : পুলিশের প্রথম কাজই হচ্ছে অপরাধ দমন। আমি আমার পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অপরাধ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজদের দমনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। সরকার অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবো।

২০০০ : পুলিশের চেইন অব কমান্ড নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়।

আইজিপি : পুলিশ বাহিনীতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রয়েছে। ফলে পুলিশকে কোনো কোনো সময় সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় না। পুলিশে যেসব জায়গায় বিশৃঙ্খলা আছে তা দূর করে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনা হবে।

২০০০ : পুলিশ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে?

আইজিপি : সহ্য করা হবে না।

২০০০ : পুলিশের দায়িত্ব পালনে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব অসুবিধার সৃষ্টি করে কিনা?

আইজিপি : এটি আপেক্ষিক বিষয়। যত বেশি লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া যায় ততই ভালো। পুলিশে লজিস্টিক সাপোর্ট যে নেই তা নয়। আবার যে খুব বেশি আছে তাও নয়। এ অবস্থার মধ্যেই পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে অস্ত্র, যানবাহন ও বাসস্থানের সুবিধা বাড়াতে হবে।

২০০০ : পুলিশের জন্য আলাদা বেতন স্কেলের দাবি উঠছে...

আইজিপি : হ্যাঁ, পুলিশের জন্য আলাদা বেতন স্কেলের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পুলিশকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই পুলিশকে উচ্চ বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত। একই সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২০০০ : দায়িত্ব পালনে আপনার কি প্রয়োজন?

আইজিপি : পুলিশ বাহিনীর সব সদস্য ও জনগণের সহায়তা।

দে • য়া • ল • লি • পি

রাষ্ট্রপতি পদের বিড়ম্বনা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদ যেমন সম্মান, শ্রদ্ধার, তেমনি বিড়ম্বনারও। সংবিধান অনুসারে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে। সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়। অথচ কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে তার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এমনকি প্রথা অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তাও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। আর সংবিধানের এই বিধানের কারণে রাষ্ট্রপতি অনেক সময় যা সঙ্গত মনে করেন তাও করতে বা বলতে পারেন না। অনেক সময় এ নিয়ে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় রাষ্ট্রপতিকে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে তার বিদায় বেলায় বেশ বড় ধরনের বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এ বছরের শুরুতে রাষ্ট্রপতি হিসাবে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার অনুমোদিত বক্তৃতা পড়তে হয় তাকে। সেখানে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা ছিল। আর নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনেও তাকেই আবার বিএনপি’র মন্ত্রিসভার অনুমোদিত বক্তৃতা পড়তে হয় যেখানে ঐ আওয়ামী লীগ সরকারের ঐসব পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা ছিল। সংবিধান সম্পর্কে সেভাবে ওয়াকিফহাল না হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টা খুবই অপ্রীতিকর ঠেকেছে। অনেকে একে বিশ্বাস ভঙ্গ বলেও বলেছেন। কোনো কোনো পত্রিকায় এ নিয়ে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির করার কিছু ছিল না। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি না করা হলে এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে সব রাষ্ট্রপতিকেই।

তিন দশক পর শোক প্রস্তাব

মৃত্যুর তিন দশক পর জাতীয় সংসদের শেষ প্রস্তাবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার আব্দুল ওহাব খানের নাম স্থান পেয়েছে। ১৯৭২-এর ১১ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করলেও জাতীয় সংসদের এ যাবৎকাল অনুষ্ঠিত কোনো অধিবেশনেই তার জন্য কোনো শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। তার পরিবারের পক্ষ থেকে এবার জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি সংসদের রেকর্ড পরীক্ষা করার জন্য সংসদ সচিবালয়কে নির্দেশ দেন। সংসদের রেকর্ডে স্পিকার ওহাব খান সম্পর্কে কোনো শোক প্রস্তাব না পাওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তার জন্য মোনাজাত করা হয়। স্পিকার ওহাব খান কবরে নিশ্চয়ই এখন শান্তিবোধ করছেন।

চন্দ্রিমা-জিয়া-চন্দ্রিমা-জিয়া

সরকার বদলের মতো নাম বদলের পালাতে পড়েছে চন্দ্রিমা উদ্যান। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমল বিভিন্ন ভবন, ট্রেন ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর নামকরণের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বিএনপি-আওয়ামী শাসনে এসব নাম পাল্টে দলের নেতাদের নামে রাখার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেই পালাতে চন্দ্রিমা উদ্যান হয়েছির জিয়া উদ্যান। আওয়ামী শাসনে ঐ পুরনো নাম আবার বহাল হয়েছিল। আবার দশ বছর পর ঘুরে চন্দ্রিমার নাম হয়েছে জিয়া উদ্যান। এই নাম ও ফলক পাল্টানোর পালা কবে শেষ হবে?

গরিবের বউ, সবার ভাবি

‘গরিবের বউ সবার ভাবি’। বাংলা এই প্রবচনটাই বলেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, গরিব হওয়াই বাংলাদেশের অপরাধ হয়েছে। গরিব ঘরের সুন্দরী বউকে সবাই ভাবি বলে আদর করতে চায়। বাংলাদেশের গ্যাসের অবস্থাও তাই। শেখ হাসিনা গরিব ঘরের সম্পদ গ্যাস কাউকে নিতে দেবেন না বলে জানান।